ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/006

ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় দান-অনুদান, ১৮৬৪-১৯৪৭

মোহাম্মদ আবুল কাউসার*

সারসংক্ষেপ: This article aims to evaluate the role of charity in Dhaka's sanitation and its residents' health protection since the establishment of Dhaka Municipality in 1864 to the end of British Colonial rule in 1947. Using primary and secondary sources, the article shows that the government's role in the medical care of the residents of Dhaka was minimal, while the local dignitaries and rich people played an important role. In addition to the development and expansion of Mitford Hospital, the role of local people was prominent in the establishment of Dhaka Medical School and Dhaka Medical College. One of the most significant steps taken to protect the interests of the people of Dhaka was the provision of filtered drinking water, which was made possible by the monetary grant of Nawab Abdul Ghani. However, there is a very few mentions of donations from the natives to deal with diseases, epidemics, and sanitary initiatives.

মুখ্যশব্দ: ঢাকা, পয়ঃনিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানীয় জল, হাসপাতাল, দান-অনুদান

১. ভূমিকা

১৬০৮ সালে ইসলাম খানের নিজামত লাভের পর সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়। ইসলাম খান রাজমহল থেকে নিজামতের সকল দপ্তর ঢাকায় স্থানান্তর

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

করে ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তুলেন। ফলে ঢাকা সুবা বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ঢাকাকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠে। পূর্ববর্তী রাজধানী সোনারগাঁওয়ের বাসিন্দা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ইসলাম খান নতুন এ শহরের নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে সুবাদার মুর্শিদকুলী খান (১৭১৬-১৭২৭ খ্রি.) কর্তৃক প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের পর ক্রমান্বয়ে ঢাকা একটি ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীতে পরিণত হয়। ১৮২৪ সালে বিশপ হেবারের ঢাকা সফরের বর্ণনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ঢাকাকে প্রাচীন মহিমার এক ধ্বংসাবশেষ হিসেবে দেখতে পান। শহরটির জমকালো সব দালান-কোঠা, নবাবদের প্রাসাদ, কলকারখানা এবং ডাচ, ফরাসি ও পর্তুগিজদের গির্জাসমূহ ধ্বংসস্তূপে এবং জঙ্গলে পরিণত হয়েছে বলে তিনি বর্ণনা করেন (মমিন ও শবনম, ২০০৯)। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ঢাকা আবার জেগে উঠতে শুরু করে। নানামুখি উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠার পর এই উন্নয়ন প্রচেষ্টা একটি সমন্বিত রূপ পায়। শহরের অবকাঠামো, শিক্ষা, চিকিৎসা, পয়ঃনিষ্কাশন, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটতে থাকে। জনগণের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ রেখে মিউনিসিপালিটি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে মিউনিসিপালিটির একার পক্ষে সেগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই ঢাকা মিউনিসিপালিটিকে সরকার এবং দেশীয় ধনাঢ্য ও দানশীল ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। সরকার ও মিউনিসিপালিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরা ঢাকার সার্বিক উন্নয়নে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এই প্রবন্ধে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যবহার করে ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন ও ঢাকাবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এসব ধনাঢ্য ও দানশীল ব্যক্তিদের দান-অনুদান কতটুকু অবদান রেখেছিল তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের কাল ১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপালিটির প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান পর্যন্ত হলেও মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে প্রাক-ব্রিটিশ ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

২. ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন ও দান-অনুদান

১৬৪০ সালে পর্তুগিজ বণিক-পর্যটক সেবাস্টিয়ান মানরিক ঢাকা ভ্রমণ করেন। তাঁর বর্ণনা থেকে তৎকালীন ঢাকার সৌন্দর্য সম্পর্কে জানা যায়। ঢাকার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তিনি

লিখেছিলেন, ঢাকা শহরটি বুড়িগঙ্গা নদীর প্রশস্ত ও সুন্দর সমতল ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত (রফিকউল্লাহ, ২০০৩, পৃ. ৬৪)। মানরিক হয়ত নদী তীরবর্তী শহর ঢাকার বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই একথা বলেছিলেন। কিন্তু রাজধানী হিসেবে ঢাকা শহর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নগরবাসীকে নানা সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছিল। বিশেষ করে নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল প্রকট। সৈয়দ শাহ আলমের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সেমসয় ঢাকার স্থানে স্থানে ডোবা-নালা, ঝিল ইত্যাদি জলাধারা থাকায় মশা-মাছি ও অন্যান্য পোকা-মাকড়ের উপদ্রব ছিল অত্যধিক। বিশেষ করে মশার উপদ্রবে নগরবাসীর জীবন ছিল অতিষ্ট। উপরন্তু, মাঝে মধ্যেই কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ত। ঢাকা শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মানুষকে মশা-মাছি ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষার প্রথম উদ্যোগ নেন সুবাদার ইসলাম খান চিশতী। তিনি একটি কৃত্রিম খাল খনন করে বুড়িগঙ্গার সাথে এর সংযোগ স্থাপন করে দেন। ফলে শহরের ময়লা-আবর্জনা এ খাল দিয়ে বুড়িগঙ্গায় নিষ্কাশিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় এবং একই সাথে যাতায়াতের জন্যও খালটি ব্যবহার করা সম্ভব হয় (আলম, ২০০৩, পৃ. ৫৬)। মুঘল আমলে কোতোয়াল পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার উপর ঢাকা শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল। আইন-ই-আকবরি ও অন্যান্য সমসাময়িক ভারতীয় ও বিদেশিদের বর্ণনা হতে কোতোয়ালের দায়িত্বের বিস্তৃত পরিধি সম্পর্কে জানা যায়। প্রহরা ও নজরদারির মাধ্যমে নগরবাসীর নিরাপত্তা, সান্ধ্য আইন আরোপ, নগরীর বাড়িঘর ও রাস্তাসমূহের তথ্য সংরক্ষণ, সময় সময় নগরে বসবাসকারীদের উপর জরিপ চালানো, তাদের আয়-ব্যয় পর্যবেক্ষণ, সন্দেহভাজন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, জনসাধারণের নৈতিকতা পর্যবেক্ষণ করা, বাজার ও দ্রব্যমূল্যের তদারকি করা, পশু জবাই ও শ্মশানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল কোতোয়ালের উপর (সিরাজুল, ২০১২)। সংগত কারণেই বহুবিধ দায়িত্বে নিয়োজিত কোতোয়ালের পক্ষে নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব ছিল না। ফলে ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যে তখন খুব একটা উন্নত ছিল না তা সহজেই অনুমেয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে ঢাকার প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ন্যস্ত করা হলেও এর পাশাপাশি কোতোয়ালও কিছু দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কোতোয়ালের দায়িত্বের পরিধি সংকুচিত হয়ে আসে এবং ১৮১৪ সালে কোতোয়ালের পদটি বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। ইতোমধ্যেই ১৮১০ সালে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও ঢাকার

গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। বড়লাট লর্ড মিন্টো এ কমিটি অনুমোদন না করলেও তাঁরা ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ কমিটিকে সাহায্য করার জন্য ১৮১৩ সালে জেলখানার কয়েদিদের পরিচ্ছন্ন কর্মে ব্যবহার করে শহরের ঝোঁপঝাড় পরিষ্কার করিয়েছিলেন (আলম, ২০০৩, পৃ. ৫৭)। ১৮১৯ সালে এমন আরেকটি কমিটি ঢাকা শহরের আশেপাশের ঝোঁপঝাড় পরিষ্কার ও রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব পালন করে। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চালর্সের সহায়তায় এ কমিটি কয়েদিদের সাহায্যে ঢাকার রাস্তাঘাটও মেরামত করেছিল। এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে ঢাকা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চলতে থাকে (আলম, ২০০৩, পৃ. ৫৭)। কিন্তু তারপরও অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নয়ন হয়নি। ১৮৪০ সালে ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেলরের বর্ণনা থেকে ঢাকা শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ও ঢাকাবাসীর স্বাস্থ্যের অবনতির কথা জানা যায়। তিনি জানান, ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে জনজীবন বিপর্যস্ত। শহরতলি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে আর শহর অভ্যন্তর গর্তে পরিপূর্ণ। আবর্জনার কারণে খাল, নালা ইত্যাদি অবরুদ্ধ হয়ে আছে। পানীয় জলের অন্যতম উৎস কূপগুলিও দূষিত হয়ে পড়েছে (ইব্রাহীম, ২০০৩, পৃ. ১৮৩)। ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা পৌরসভা। ঢাকা পৌরসভা বা মিউনিসিপালিটির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল শহরের জঙ্গল পরিষ্কার এবং বর্জ্য অপসারণ। এসময় শহরের বিভিন্ন স্থান দিয়ে প্রবাহিত খালগুলো ভরে যাওয়ায় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে ঢাকা একটি অস্বাস্থ্যকর শহরে পরিণত হয়। ঢাকার এ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন বিদেশি পর্যটক লিখেন, ঢাকা শহরের অন্তত দুই মাইল দূর হতে বুড়িগঙ্গা নদীর বর্জের দুর্গন্ধ পাওয়া যেত (মামুন, ১৯৯১, পৃপৃ. ৩৭-৩৮)। নগরবাসীর ট্যাক্সের টাকা, সরকারি অনুদান ও ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে ঢাকা মিউনিসিপালিটি কর্তৃপক্ষ নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ও রোগ-বালাই নিরোধে যথাসাধ্য চেষ্টা চালালেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল। ফলে ঢাকার ধনাঢ্য দানশীল ব্যক্তিবর্গ নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

২.১ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ

১৮৭৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকাবাসীর পানীয় জলের উৎস ছিল বুড়িগঙ্গা, খাল পুকুর এবং পাতকুয়োর পানি। ফলে সারা বছর রোগ-বালাই, বিশেষ করে, কলেরা লেগেই থাকত (মামুন, বা. ১৪০০, পৃপৃ. ১০-১১)। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মি. সিমসন যুক্তি দেখান যে,

যদি পরিকল্পিতভাবে ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যেত তাহলে বুড়িগঙ্গার পানি বিশুদ্ধ থাকত। ফলস্বরূপ ঢাকাবাসীকে পানি পরিশোধন করে সরবরাহের প্রয়োজনীয়তাও কমে যেত। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় সরকার ঢাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থ ব্যয় করতে অনীহা প্রকাশ করে। মি. সিমসন বুড়িগঙ্গায় বর্জ্য নিক্ষেপ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন করে লালবাগে একটি রিজার্ভার থেকে তা শোধন করে তিনটি লাইনের সাহায্যে শহরের তিনটি এলাকায় পানি সরবরাহের পরিকল্পনা দেন। কিন্তু দেখা গেল এমন সাদাসিধে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মতো আর্থিক সামর্থ্যও ঢাকা মিউনিসিপালিটির নাই। এসময় নবাব আব্দুল গণি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন (শরীফ, ১৯৮৬, পৃ. ২০১)। ১৮৭১ সালে খাজা আব্দুল গণি তাঁর দানশীলতা ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য এবং সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ ভারত সরকার কর্তৃক সি.এস.আই উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর এ সম্মান প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রিন্স অব ওয়েলসের রোগমুক্তি (ভয়ানক টাইফয়েড) উপলক্ষ্যে আব্দুল গণি ঢাকাবাসীর কল্যাণে ব্যয়ের জন্য সরকারকে ৫০,০০০ টাকা প্রদান করেন। এ টাকা খরচের জন্য গঠিত কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, অনুদানের টাকায় ঢাকাবাসীর জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আরও টাকার প্রয়োজন হলে আব্দুল গণি সর্বমোট ২ লক্ষ টাকা প্রদান করেছিলেন। ১৮৭৪ সালে লর্ড নর্থব্রুক এ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৮৭৮ সালে ঢাকা বিভাগের কমিশনার পিকক তা উদ্বোধন করেন (শরীফ, ১৯৮৬, পৃ. ২০২, দ্রষ্টব্য মামুন, বা. ১৪০০, পৃপৃ. ১০-১১)। ফলে নওয়াব আব্দুল গণির প্রদত্ত অর্থে ঢাকাবাসীর জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এজন্য সরকার জনগণের উপর কোন ট্যাক্স আরোপ না করার সিদ্ধান্ত নেয় (তায়েশ, ১৯৮৫, পৃ. ১৮২)।

প্রথমদিকে শহরের বড় বড় রাস্তায় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলেও অনেক ছোটো রাস্তায় জল সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপাল কমিটি জলের কল বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়। এসময় ডিউক অব কনট কলকাতা আগমন করেন। তাঁর আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নবাব আহসান উল্লাহ ১১,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। এ টাকায় নবাবপুর হতে ঠাটারিবাজার ও দেলখোসবাগ পর্যন্ত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হয়– যা ডিউক কনটের নামানুসারে 'কনট এক্সটেনশন' হিসেবে অভিহিত হবে বলে স্থির হয় (যতীন্দ্রমোহন, ২০০৭, পৃ. ২১০)। ক্রমান্বয়ে ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানীয় জলের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ফলে পানীয় জল সরবরাহ

ব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। জনগণের অর্থ সহায়তা না পাওয়া গেলেও ব্রিটিশ সরকারকে নিজ উদ্যোগেই তা এগিয়ে নিতে হয়। ১৯০৩ সালে বাংলার স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার মি. সিল্ক ঢাকার পানি সরবরাহের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ঢাকার সুপারেন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মি. সুইট এ সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তাঁদের এসব প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে তা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মি. ডব্লিউ ম্যাকডোনাল্ড তাঁর সুনির্দিষ্ট মতামত দেন যা বাস্তবায়নে ৩,৬০,৬৭৬ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হয় (ম্যাকডোনাল্ড, ১৯০৭) । যেহেতু নবাব সলিমুল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের শর্ত ছিল যে, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বিপরীতে জনগণের উপর কোন করারোপ করা যাবে না, সেহেতু পূর্ব থেকেই বিকল্প উপায়ে উল্লিখিত অংকের অর্থ যোগাড়ের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আপাতত প্রয়োজন মেটানো হবে এবং পরবর্তীকালে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে ঋণের কিস্তি শোধ করা হবে বলে স্থির হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, পুলিশ লাইন, রেলওয়ে, পাগলা গারদ, বরফকল, হোস্টেল ইত্যাদি থেকে এ বাড়তি অর্থ যোগাড়ের সিদ্ধান্ত হয়েছিল (রেনকিন, ১৯০৪) । কিন্তু ১৯০৮ সালে মিউনিপালিটি কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনাটিকে আর সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সরকারের নিকট আবেদনের পূর্বে পরিকল্পনাটি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সেনিটারি ইঞ্জিনিয়ার মি. সি. ই. হাউসডেনের নিকট প্রেরণ করে। সম্প্রসারিত প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারিত হয় ৫,০০,০০০ টাকা। বাড়তি খরচ মেটানোর জন্য সরকারের নিকট ২,০০,০০০ টাকা অনুদানের আবেদন করা হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার ঢাকার উন্নয়নে এতটাই আন্তরিক ছিল যে, ৩,০০,০০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করে (ইউসুফ, ১৯১০)। ফলে সরকারের নিকট ৩ লক্ষের বদলে ২ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করে ঢাকা মিউনিসিপালিটি। অবশ্য ঋণের টাকা পাওয়ার পূর্বেই ইংল্যান্ডের মেসার্স জেমস সিম্পসন এন্ড কো. এর মাধ্যমে গোটা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা এবং টাকা পাওয়ার পর সে বিল পরিশোধ করা হয় (ইউসুফ, ১৯০৯)।

নবাব আব্দুল গণির কল্যাণে ঢাকাবাসী বিনা খরচে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পেয়েছিল যা ভারতের অন্য কোনো শহরের অধিবাসীরা পায়নি (ইউসুফ, ১৯১০)। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের পরের বছরই এর সুফল পাওয়া গেলো। ১৮৮৯ সালে ঢাকা মিউনিসিপালিটির বার্ষিক বিবরণীতে ভাইস চেয়ারম্যান খাজা মুহাম্মদ আসগর মন্তব্য করেন যে, চলতি বছর ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় কলেরা ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ বিগত বছরের

তুলনায় কম পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তিনি মনে করেন ঢাকা শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে (শরীফ, ১৯৮৬, পৃ. ২০৭)। ১৮৮০ সালে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত এক বক্তব্য থেকেও একইরকম আশাব্যঞ্জক খবর পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ শুরু হওয়ার পর থেকে যারা এ সুবিধা পেয়ে আসছে তাদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমেছে। প্রতি বছর মহামারি আকারে কলেরা যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করত তা থেকে নগরবাসী মুক্তি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, জ্বর, আমাশয়সহ অন্যান রোগেরও প্রকোপ কমেছে (শরীফ, ১৯৮৬, পৃ. ২০৭)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্পটি যে বছর উদ্বোধন করা হয় সেই বছর অর্থাৎ ১৮৭৮ সালে ঢাকা শহরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল ১১৯ জন। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ১৮৮১ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ১৪ জনে (কেদারনাথ, ২০০৮, পৃ. ৯২)। নবাব আব্দুল গণি ও নবাব আহসান উল্লাহর আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঢাকা শহরের সর্বত্র যে পানীয় জল প্রাপ্তির সুবিধা পৌঁছায়নি এর প্রমাণ পাওয়া যায় শামসুর রাহমানের বর্ণনা থেকে। ১৯৩০ এর দশকের ঢাকার ভিস্তিওয়ালা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> ...আসতো সে ভরা ফোলা ফোলা মশক পিঠে বয়ে, ফিরে যেতো মস্ত চুপসে যাওয়া, হাওয়া নেই বেলুনের মতো মশকটা কাঁধে ঝুলিয়ে। মশকটাকে ওর শরীর থেকে আলাদা কিছু বলে ভাবতে পারতাম না। মনে হতো ওটা বুঝি ওর শরীরেই গজিয়ে উঠেছে। একদিন পানির কল এলো আমাদের মাহুতটুলির বাড়িতে। সেই সঙ্গে বিদায় নিল ভিস্তি (শামসুর, ১৯৯০, পৃপৃ. ৬০-৬১)।

২.২ রাস্তা ও ড্রেন মেরামত

আলোচ্য সময়ে ঢাকাবাসীর মধ্যে নিজের অথবা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের নামে বিভিন্ন রাস্তার নামকরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আর এ নামকরণের জন্য তারা পানির কল বা বিজলি বাতির সম্প্রসারণ, রাস্তা বা ড্রেন মেরামত ইত্যাদি কাজে অনুদান দিয়ে নিজ বা পরিবারের সদস্যদের নামে সংশ্লিষ্ট রাস্তার নামকরণ করিয়েছেন। যেমন: ১৯১০ সালে ৫০০ টাকার বিনিময়ে আলমগঞ্জের অংশবিশেষের নামকরণ করা হয় নবীনচন্দ্র গোস্বামী লেন, ১৯২১ সালে ৩০০ টাকায় সোনার টুলি হয় মনোহরচন্দ্র রায় লেন, ২৫০ টাকায় জামদানি নগর হয় হরিপ্রসন্ন মিত্র রোড ইত্যাদি। এভাবে অর্থের বিনিময়ে রাস্তার নামকরণের হিড়িক

পড়ে গেলে ১৯৩২ সালে মিউনিসিপালিটি সর্বনিম্ন অনুদানের পরিমাণ ২,০০০ টাকা এবং ১৯৩৪ সালে তা ৫,০০০ টাকায় উন্নীত করে (নাজির, ২০০৩, পৃ. ৫৩; দ্রষ্টব্য নাজমুন, ১৯৯৯)। যে কারণেই স্থানীয় অর্থশালী ব্যক্তিবর্গ এসব অনুদান প্রদান করুক না কেন, অনুদানের এসব অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করা হয় এবং বেশিরভাগ সময়ই এসব অর্থ ব্যয় হয় নগরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা যেমন: পানীয় জলের সুবিধা সম্প্রসারণ, ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকার নবাব পরিবারের দান-অনুদান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। নবাব আব্দুল গণির দানশীলতা বিশ্লেষণ করে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, দেশীয়দের জন্য আব্দুল গণি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। এছাড়া বিদেশিদের জন্য তাঁর ব্যয় দেশীয়দের জন্য ব্যয়কৃত অর্থের চেয়ে বেশি না হলেও খুব কমও ছিল না। আর দেশীয়দের জন্য তাঁর ব্যয় দেশীয়দের কল্যাণের কথা ভেবে নয় বরং ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের এ অঞ্চলে আগমণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সরকারের অনুরোধে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা করেছেন (মামুন, বা. ১৪০০, পৃ. ১১)। তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থনে মুনতাসীর মামুন *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত আব্দুল গণির দানের একটি দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরেন, যদিও এ তালিকা তাঁর বক্তব্য সমর্থনে যথেষ্ট নয় বলে মনে করা যায়। অন্যদিকে অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ মনে করেন, ঢাকার নবাব পরিবারের উত্থান এমন একটি সময়ে হয়েছিল যখন মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ছিল নেতিবাচক। তাই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং এই সরকারের কৃতজ্ঞতা অর্জন ব্যতীত নবাব পরিবারের সদস্যদের পক্ষে ঢাকার উন্নয়ন তথা স্থানীয় অধিবাসীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত বা অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা সম্ভব ছিল না। তাই ঢাকার নবাব পরিবার শুধু নিজ স্বার্থে এবং খ্যাতি অর্জনের জন্য ঢাকার উন্নয়নে এগিয়ে এসেছিলেন এ কথা বলা যায় না (সুফিয়া, ২০০৩, পৃ. ৩৫)।

২.৩ সমাধিক্ষেত্র

ঢাকায় দুইটি পুরাতন শ্মশান ঘাট ছিল। একটি পূর্বদিকে দোলাই খালের তীরে দয়াগঞ্জে, অন্যটি পশ্চিম দিকে বুড়িগঙ্গার চর বাগচান্দকায় । কিন্তু জ্বালানি কাঠের উচ্চমূল্য এবং শ্মশানে মৃতদেহ পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত ডোমদের অত্যধিক চাহিদার কারণে দরিদ্র হিন্দুদের

সম্পূর্ণভাবে মৃতদেহ পোড়ানোর সামর্থ্য ছিল না। তাই আধা-পোড়া মৃতদেহগুলোকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো। শুরুতে ঢাকা মিউনিসিপালিটি মৃতদেহগুলো যাতে ভালোভাবে পোড়ানো হয় তার উপর গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু শ্মশান ঘাট দুইটির অবস্থান শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে হওয়ায় বর্ষাকালে সেখানে পৌঁছানো কষ্টকর ছিল। ১৮৬৯ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রাহাম এক জনসভায় শহরের নিকটবর্তী স্থানে দুইটি পাকা শ্মশান ঘাট নির্মাণের জন্য হিন্দুদের নিকট সহযোগিতা চান। নবাবপুরের বসাকরাসহ অনেক হিন্দু তাতে সাড়া দেয় এবং সহযোগিতার অঙ্গীকার করে। কিন্তু আশানুরূপ অর্থ না পাওয়া যাওয়ায় সেসময় পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা যায়নি। অবশেষে ১৮৭৪ সালে মিউনিসিপালিটি পোস্তখোলার শিলবাড়ি এবং কানুজিস চরে দুইটি শ্মশান ঘাট নির্মাণ করে। আর এ ঘাট দুইটি নির্মাণের সিংহভাগ খরচ বহন করেন সাবেক মিউনিসিপালিটি কমিশনার ও ঢাকার জমিদার বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত। মিউনিসিপালিটির কঠোর নিয়ন্ত্রণে ঘাট দুইটিতে ঠিকাদারগণ নির্দিষ্ট মূল্যে জ্বালানী কাঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করত। প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য এ মূল্য ছিল ৩.৫ রুপি এবং ১০ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য ছিল ১ রুপি ২ আনা। মিউনিসিপালিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত ডোম শবদাহের কাজ তদারকি করত। কিন্তু মিউনিসিপালিটির শ্মশানে একই স্থানে সকল বর্ণের হিন্দুদের শবদাহ করার প্রতিবাদে কিছু উচ্চ বর্ণের হিন্দু নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র শবদাহ করার ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের দরিদ্র হিন্দুরা মিউনিসিপালিটি নির্ধারিত খরচকে অত্যধিক বলে অভিযোগ করে। তবে ঘাট দুইটি প্রতিষ্ঠার ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে ঢাকাবাসীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমে আসে (শরীফ, ১৯৮৬, পৃপৃ. ২০৮-২০৯)।

একই সময় মিউনিসিপালিটি কর্তৃপক্ষ যত্রতত্র মৃতদেহ সমাধিস্থ করার মতো বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়। ইউরোপীয়, আর্মেনীয় এবং ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের তিনটি সমাধিক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা ভালোই ছিল। শহরের মুসলমানদের কবরস্থানগুলোতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। এছাড়া মুসলমানরা তাদের বাড়ির আঙিনায় অথবা বাড়ির আশে পাশের খালি জায়গায় কবর দিত। ঢাকার সিভিল সার্জন ডাক্তার জেমস ওয়াইজ এটাকে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি বলে মন্তব্য করেন। ১৮৬৭ সালে মিউনিসিপালিটির পক্ষ থেকে আগা সাদেক কবরস্থানটি সংস্কার করা হলেও শহরের অন্যান্য কবরস্থানগুলো বন্ধ না করায় খুব কম সংখ্যক মুসলিমই আগা সাদেক কবরস্থানটি ব্যবহার করত। ১৮৬৮ সালে ১২টি পুরাতন

সরকারি ও বেসরকারি কবরস্থান বন্ধ করে দেয়া হয় এবং মিউনিসিপালিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে কবর দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়। একই সময় ঢাকার উত্তর ও পূর্ব দিকের জনগণের জন্য পুরানা পল্টনে আরেকটি কবরস্থান তৈরি করা হয়। ১৮৮৯ সালে গেন্ডারিয়ায় নতুন আরও একটি কবরস্থান তৈরি করা হয়। মিউনিসিপালিটির এসব উদ্যোগের ফলে বসতবাড়ি ও এর আশে পাশে কবর দেয়া কমলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি (শরীফ, ১৯৮৬, পৃ. ২০৯)। মুসলমানদের জন্য নতুন নতুন কবরস্থানের জমি ক্রয় ও উন্নয়নের ব্যয়ভার মূলত ঢাকা মিউনিসিপালিটি বহন করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গও সহযোগিতা করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে রায় সাহেব দীন নাথ সেনের কথা বলা যায়। তিনি গেন্ডারিয়া কবরস্থানের জন্য মিউনিসিপালিটিকে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন (শরীফ, ২০০৩, পৃ. ২৯৪)।

২.৪ পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১৯২০ সালে নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় একটি পশু হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ৩.৩ একর জমি দান করেন (নূরুল, ২০০৩, পৃ. ৪৭৪)। আপাতদৃষ্টিতে পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সাথে ঢাকাবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোনো সম্পর্ক না পাওয়া গেলেও এ দুইয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। কারণ তখন ঢাকা শহরে কোনো সমন্বিত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল না। ঢাকা শহরের মনুষ্য বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য পরিবহণ করে শহরের বাইরে নির্দিষ্ট কিছু স্থানে মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। আর এ কাজটি সম্পন্ন হতো বলদে টানা গাড়ি দিয়ে (বেম্বার, ১৯০৯)। ১৯০৮ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সেনিটারি কমিশনারের একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কনজার্ভেন্সি কাজের জন্য রক্ষিত ৪০ থেকে ৫০টি পশুর মধ্যে মাত্র ১ টি পশু বর্জ্য পরিবহণের উপযুক্ত ছিল। অন্যগুলো ছিল ক্ষীণকায় ও যত্নহীন। অনেক পশু চিকিৎসাহীন অবস্থায় গায়ে দৃশ্যমান ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছিল। তাঁর মতে, এমন জীর্ণ-শীর্ণ ও রোগাক্রান্ত পশু দ্বারা কোনোভাবেই ভালো কনজার্ভেন্সি ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে, যদি কয়েক বছর পূর্বের মতো আবারও একটি মহামারি বা মড়ক দেখা দেয় তাহলে তিনি অবাক হবেন না (হেয়ার, ১৯০৮)। সুতরাং ঢাকায় একটি পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা যে পরোক্ষভাবে ঢাকাবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলা অযৌক্তিক হবে না।

৩. স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দান-অনুদান

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ঢাকা তথা সমগ্র বাংলায় হাকিমি বা কবিরাজি চিকিৎসা ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। মুঘল রাজধানী ঢাকায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাকিমি চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেক হাকিম ও কবিরাজ চিকিৎসা করতেন। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে হাকিমি চিকিৎসা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হারালেও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেশীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলতে থাকে। ১৮০৩ সালে সরকার ঢাকায় একটি নেটিভ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এ হাসপাতালের সক্ষমতা ছিল খুবই কম (শরীফ, ২০০৭, পৃপৃ. ২-৩)। সরকার এই হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসে ১৫০ টাকা এবং কলকাতা হতে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করত। দেশীয় জনগণ ও কয়েকজন ইউরোপীয়দের কাছ থেকে ২,২০০ টাকা চাঁদা তুলে তা বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এই বিনিয়োগ থেকে আগত মুনাফা দ্বারা হাসপাতালের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হতো। ১৮৫৮ সালে মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হলে নেটিভ হাসপাতালটি এর সাথে একীভূত হয়ে যায়। ফলে নেটিভ হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহে সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেছিল তা মিটফোর্ড হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ করে (যতীন্দ্রমোহন, ২০০৭, পৃ. ২১৪)। ক্রমান্বয়ে ঢাকার জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। বিদ্যমান চিকিৎসা সেবার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে কখনও সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আবার কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঢাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ দান-অনুদানের মাধ্যমে ঢাকার চিকিৎসা সেবার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে এগিয়ে আসেন, যা নিচে আলোচনা করা হলো।

৩.১ মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ

মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল ব্যক্তিগত অনুদানের ভূমিকা। ১৮৩৬ সালে ঢাকার প্রথম কালেক্টর রবার্ট মিটফোর্ড মৃত্যুকালে ঢাকার জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য তাঁর বিপুল সম্পত্তি দান করে যান, যার মূল্য ছিল প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু এ বিষয়ে মিটফোর্ডের উত্তরাধিকারীগণ আপত্তি জানালে ১৮৫০ সালে ইংল্যান্ডের চ্যান্সেরি কোর্ট বাংলা সরকারকে আংশিক অর্থ প্রদানের রায় দেয়। ফলে সরকার মিটফোর্ডের দানকৃত অর্থ হতে ১,৬৬,০০০ টাকা পায়। এই টাকা দিয়েই ১৮৫৪ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৮৫৮ সালে সমাপ্ত হয় (যতীন্দ্রমোহন, ২০০৭, পৃ. ২১৩)।

১৮৬০ এর দশক নাগাদ মিটফোর্ড হাসপাতাল একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং এর সুনাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে ১৮৬৬ সালে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা মিটফোর্ড হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম নিয়ে একটি সমালোচনামূলক প্রতিবেদন ছাপায় যা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডাক্তার বিটসনের পরামর্শে ১৮৬৮ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে স্থানীয় কিছু দায়িত্বশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রথম স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে এ কমিটির সদস্য হন খাজা আব্দুল গণি ও তাঁর পুত্র খাজা আহসান উল্লাহ (শরীফ, ২০০৭, পৃ. ৫৭)। তাদের এ সংশ্লিষ্টতা মিটফোর্ড হাসপাতালের উন্নয়নে দেশীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে আরো বেশি চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হাসপাতালটি যেহেতু সরকারি ছিল না সেহেতু সরকার এর পূর্ণ আর্থিক দায়ভার নিতে সম্মত হয়নি। তবে যদি সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব থাকে এবং এ প্রস্তাব বাস্তবায়নে জনগণ আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে আসে তাহলে সরকার বিষয়টি বিবেচনা করবে বলে জানানো হয়। এ সময় জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এমনই ছিল। কারণ এক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় করার সক্ষমতা ছিল সীমিত (শরীফ, ২০০৭, পৃ. ৮৭)। ফলে মিটফোর্ড হাসপাতালের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হয়েছিল মূলত দেশীয় ধনাঢ্য ও দানশীল ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক সহযোগিতায়।

৩.১.১ ফিমেল ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা

সরকারের উপরিউক্ত মনোভাব সম্পর্কে জানতে পেরে হাসপাতাল কমিটি মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি ফিমেল ওয়ার্ড নির্মাণের জন্য জনগণের কাছে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানায় (শরীফ, ২০০৭, পৃ. ৮৮)। তখন পুরুষ ও মহিলা রোগীদেরকে একই ভবনে চিকিৎসা দেয়া হতো। একটা পার্টিশন ওয়াল দিয়ে মহিলা রোগীদের পৃথক করা হলেও কিছু সমস্যা থেকেই গিয়েছিল। পুরুষ রোগীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। ১৮৭৫ সালে হাসপাতাল কমিটি একটি আলাদা ভবনে ২০ শয্যার একটি ফিমেল ওয়ার্ড নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়, যার আনুমানিক ব্যায় নির্ধারণ হয় ২০,০০০ টাকা। সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী জনগণের নিকট আর্থিক সহায়তার আবেদন জানানো হলে খাজা আহসান উল্লাহ এজন্য ২০,০০০ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু

হাসপাতালের সংকীর্ণ পরিসরে নতুন আরেকটি ভবন নির্মাণ করা হলে হাসপাতাল চত্বরটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি হয়ে পড়বে। এছাড়া ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয়দের জন্য আলাদা ওয়ার্ড নির্মাণের চাহিদা এসেছে। ফলে অতিরিক্ত জমি ক্রয় করে হাসপাতালের সীমানা বৃদ্ধি করা জরুরি হয়ে পড়ে। হাসপাতালের পূর্ব দিকে একটি উপযুক্ত স্থানও ছিল। তবে তা ক্রয়ের জন্য ১৭,০০০ টাকা প্রয়োজন ছিল। ভাওয়ালের জমিদার কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর জমি ক্রয় বাবদ ২০,০০০ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ফলে ফিমেল ওয়ার্ড ও নতুন জমি কেনার অর্থের সংস্থান হয় (শরীফ, ২০০৭, পৃপৃ. ৯১-৯২)। শুধু নবাব জমিদারগণই নন ঢাকার মহল্লা সর্দারগণও মিটফোর্ড হাসপাতালের উন্নয়নে অর্থ প্রদান করেন। ঢাকার প্রভাবশালী মহল্লা সর্দার ও ব্যবসায়ী জনাব এম. এ. কাদের ১৯৪৪ সালে ৮,০০০ টাকা অনুদান দিয়ে ফিমেল ওয়ার্ডের তিনটি শয্যার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ অর্থ বিনিয়োগ করে যে মুনাফা পাওয়া যায় তা দিয়ে মহিলা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হয়। জনাব এম. এ. কাদেরের ইচ্ছা অনুযায়ী শয্যা তিনটিতে তাঁর দুই স্ত্রী এম. বদরুন্নেসা ও এম. আসিয়া খাতুন এবং আশ্রিতা কৃষ্ণ কুমারী দাসীর স্মরণে তাঁদের নাম ব্রোঞ্জের প্লেটে খোদাই করে রাখা হয় (শরীফ, ২০০৭, পৃ. ১৬৭)।

৩.১.২ খ্রিষ্টানদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা

১৮৭৬ সালে খ্রিষ্টান রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একজন আর্মেনীয় এফ. এ. বার্জন মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি ৪-কক্ষ বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য ৪,০০০ টাকা উইল করে রেখে যান। এর অল্প কিছুদিন পরেই স্থানীয় আরেক জন আর্মেনীয় এ. এন. পোগোজ নির্দিষ্ট ফি-র বিনিময়ে ৪ জন ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় রোগীর চিকিৎসার জন্য একটি পৃথক ওয়ার্ড নির্মাণের জন্য ৩,০০০ টাকার উইল করে যান। কিন্তু তাদের এ দানের অর্থ তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য অপ্রতুল হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ টাকা বিনিয়োগ করে যা ১৮৮৬ সালে ১২,০০০ টাকায় পরিণত হয়। এ অর্থ দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের লক্ষ্য পূরণ করে (শরীফ, ২০০৭, পৃ. ৯৪)।

৩.১.৩ চক্ষু ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা

ভাগ্যকূলের জমিদার রাজা শ্রীনাথ রায়ের মাতা শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যান এবং বেশ কষ্ট ভোগ করে ১৮৮৯ সালে তিনি মারা যান। মায়ের এ কষ্টের কথা স্মরণ রেখে রাজা শ্রীনাথ রায় তাঁর

মা সুভদ্রা চৌধুরাণীর নামে ঢাকায় অন্ধ মানুষ অথবা কুষ্ঠ রোগীদের জন্য ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং এজন্য ৩০,০০০ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। হাসপাতালটি অন্ধদের জন্য হবে নাকি কুষ্ঠ রোগীদের জন্য হবে তা নির্ধারণের ভার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পণ করেন। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, হাসপাতালটি নির্মাণে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে সরকার বা মিউনিসিপালিটি এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। ১৮৯১ সালে ঢাকার স্থানীয় প্রশাসন ও মিউনিসিপালিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, একটি পৃথক হাসপাতালের পরিবর্তে রাজা শ্রীনাথ রায়ের অর্থ দিয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে পৃথক একটি ভবন নির্মাণ করে 'সুভদ্রা চৌধুরাণী চক্ষু ওয়ার্ড' স্থাপন করা হবে। ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয় ধরা হয় ১০,০০০ টাকা এবং বাকি ২০,০০০ টাকা দিয়ে একটি এনডাওমেন্ট ফান্ড গঠন করা হবে (শরীফ, ২০০৭, পৃপৃ. ১১১-১১২)। ১৯৩৭ সালে ভাগ্যকূলের জমিদারগণ এ চক্ষু ওয়ার্ডটির আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য আবারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এ উদ্দেশ্যে কুমার প্রমথনাথ রায় ৫,০০০ টাকা, রাজা জানকীনাথ রায় ৫,০০০ টাকা এবং বাবু যদুনাথ রায় ও বাবু প্রিয়নাথ রায় ৫,০০০ টাকা অনুদান দেন। তাঁদের প্রদত্ত সর্বমোট ১৫,০০০ টাকা দিয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালের চক্ষু ওয়ার্ডটির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের ফলে এটা সমগ্র বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত হয় (শরীফ, ২০০৭, পৃ. ১৬৬)।

৩.১.৪ জনসন ওয়ার্ড, হেয়ার ওয়ার্ড, শঙ্খনিধি ওয়ার্ড ও আসমতুন্নেসা ওয়ার্ড

১৮৮০ এর দশকের শেষ দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত রোগী আসার কারণে বাধ্য হয়ে অনেক রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দিতে হতো। এ সমস্যা সমাধানে ভাওয়ালের জমিদার রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি পৃথক ওয়ার্ড নির্মাণের সকল ব্যয় নির্বাহে সম্মত হন। তাঁর ইচ্ছায় নতুন এই ওয়ার্ডটির নামকরণ করা হয় ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার লুটম্যান জনসনের নামে। চার কক্ষ বিশিষ্ট জনসন ওয়ার্ডটি নির্মাণে ৫,০০০ টাকার কিছু বেশি খরচ হয় যার পুরোটাই রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ বহণ করেন (শরীফ, ২০০৭, পৃপৃ. ১১৩-১১৬)। মিডফোর্ড হাসপাতালে একটি অত্যাধুনিক ওয়ার্ড নির্মাণের জন্য ১৯০৯ সালে সন্তোষের মহারাণী রায় দিনমনি চৌধুরী ৫০,০০০ টাকা প্রদান করেন। এই ওয়ার্ডে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উদ্ভাবিত সর্বশেষ যন্ত্রপাতি সরবরাহের শর্ত জুড়ে দেন এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের তৎকালীন গভর্ণর স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের স্মৃতি

রক্ষার্থে তাঁর নামে ওয়ার্ডটির নামকরণের প্রস্তাব করেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যথাসময়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় (শরীফ, ২০০৭, পৃ. ১৪৪)। ১৯১০ সালে সাধারণ চিকিৎসার জন্য ঢাকার অন্যতম ধনাঢ্য পরিবারের সহযোগিতায় ভজহরি শঙ্খনিধি ওয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। বাবু গৌর নিতাই শঙ্খনিধি এ ওয়ার্ড নির্মাণের ব্যয় হওয়া ২৫,০০০ টাকা প্রদান করেন (শরীফ, ২০০৭, পৃ. ১৩৩)। নবাব সলিমুল্লাহ তাঁর পিতামহীর স্মরণে মিটফোর্ড হাসপাতালে আসমতুন্নেসা ওয়ার্ড স্থাপন করেন (তাইফুর, ১৯৫৬, পৃ. ২৫৬)।

৩.১.৫ এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল

১৯১০ সালে ইংল্যান্ডের রাজা ও ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষায় সমগ্র ভারতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর স্যার ল্যান্সলেট হেয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সম্রাটের স্মৃতির উদ্দেশে একটি 'King Edward Memorial Fund' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত প্রদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ৫ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। এই অনুদানের টাকায় মিটফোর্ড হাসপাতালে 'King Edward Memorial Hall' নামে একটি নতুন ভবন এবং শিলং-এ একটি পাস্তুর ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (শরীফ, ২০০৭, পৃপৃ. ১৪২-১৪৩)।

৩.১.৬ লেবার ওয়ার্ড স্থাপন

১৯২০ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালকে সরকারি হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। সরকারি হাসপাতালে রূপান্তরের পরেও এ হাসপাতালের উন্নয়নে জনসাধারণের সহযোগিতা অব্যাহত থাকে। ১৯৩০ এর দশকেও মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রসূতিদের জন্য পৃথক কোনো ওয়ার্ড ছিল না। গর্ভবতী মেয়েদের জন্য মহিলা ওয়ার্ডের একাংশকে সংরক্ষিত করে সেখানে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা হতো। ১৯৩২ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ঢাকার ধনাঢ্য ব্যক্তি রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্র কুমার দাস তাঁর বাবা রায়বাহাদুর রেবতী মোহন দাসের নামে একটি পৃথক ম্যাটার্নিটি বা প্রসূতি ওয়ার্ড নির্মাণে অর্থ সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। তাঁর ভাই বাবু হেমেন্দ্র কুমার দাস মিটফোর্ড হাসপাতালে জনগণকে হ্রাসকৃত ফি-এর বিনিময়ে এক্স-রে সেবা প্রদানের বিনিময়ে এই খাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। উল্লিখিত দুইটি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে রায়বাহাদুর ও তাঁর ভাই যথাক্রমে ৪০,০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন। কিন্তু নতুন ওয়ার্ডের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণ

করলে হাসপাতালের অন্যান্য ভবনে আলো ও বাতাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে। উপরন্তু, ভবন নির্মাণে অনুদানের সমুদয় টাকা ব্যয় হয়ে যাবে বিধায় ভবনের রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকবে না। তাই সরকার ১৯৩৪ সালে ডাফরিন ওয়ার্ডকে রূপান্তর করে একটি চার শয্যা বিশিষ্ট লেবার ওয়ার্ড নির্মাণের অনুমোদন দেয়। কেননা তখন লেডি ডাফরিন ওয়ার্ডটি খুব বেশি ব্যবহৃত হচ্ছিল না। তাই এ ওয়ার্ডের সাথে একটি ছোটো আচ্ছাদিত বারান্দা সংযোজন করে লেবার ওয়ার্ডটি স্থাপন করে ডাফরিন ওয়ার্ডটিও এ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। লেবার ওয়ার্ডের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ না করার ফলে মাত্র ১০,০০০ টাকায় ডাফরিন ওয়ার্ডকে রূপান্তরের কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। অবশিষ্ট টাকা ৩.৫% সুদে সরকারি প্রমিজরি নোটে বিনিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে দেশের সব হাসপাতালের এক্স-রে ফি এক হওয়ায় সরকারিভাবে মিটফোর্ড হাসপাতালের এক্স-রে ফি কমানো সম্ভব ছিল না। তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিকল্প উপায়ে এক্স-রে ফি কমানোর ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি গুচ্ছ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। অনুদানের ৫০,০০০ টাকা হতে প্রসূতি ওয়ার্ড নির্মাণ বাবদ খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা সরকারি প্রমিজরি নোটে ৩.৫% সুদে বিনিয়োগ করা হবে। ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তহবিল থেকে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে হ্রাসকৃত ফি-এর বিনিময়ে এক্স-রে সেবা প্রদানে সক্ষম হবে। (শরীফ, ২০০৭, পৃপৃ. ১৬৪-১৬৫)।

৩.২ ঢাকা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা

১৮৭৫ সালে ঢাকা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার পর কিছু অস্থায়ী স্থাপনা ও ভাড়া বাড়িতে মেডিকেল স্কুলের কার্যক্রম চলে আসছিল। স্কুলের জন্য স্থান নির্বাচন, জমি ক্রয় ও ভবনের নকশা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরও সরকারি অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ সরকার এ স্কুল সম্প্রসারণ এবং এর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিতে আগ্রহী ছিল না। যদি তা করতেই হয়, এর জন্য মেডিকেল শিক্ষার্থী ও জনগণকে আর্থিকভাবে কিছুটা অবদান রাখতে হবে। আর এটাই ছিল সরকারের তখনকার দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে পূর্ব বাংলার ধনী ব্যক্তিগণ মেডিকেল স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ১৮৮৭ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনের জুবিলি উদযাপন উপলক্ষ্যে এ সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়। জুবিলি উপলক্ষ্যে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়। ঢাকা বিভাগের কমিশনার ডব্লিউ. আর. লারমিনি ঢাকায়ও এ ধরনের উৎসব আয়োজন করে জনহিতকর

কাজের উদ্যোগ নেন এবং পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট আর্থিক সহায়তার আবেদন জানান। সুনির্দিষ্টভাবে তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্যের অনুরোধ জানান। এ অনুরোধে সাড়া দিয়ে পূর্ববাংলার ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ৬৪,০০০ টাকা প্রদান করেন। এর মধ্যে ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ২০,০০০, ময়মনসিংহের রাজা সূর্যকান্ত আচার্য ১০,০০০ টাকা, ঢাকার জমিদার ও ব্যবসায়ী বাবু রঘুনাথ দাস ১৫,০০০ টাকা, সৈয়দ মাহমুদ আলী খাঁ ৫,০০০ টাকা, শ্রীমতি বিশ্বেশ্বরী দেবী ২,০০০ টাকা এবং অন্যান্যরা ১২,০০০ টাকা প্রদান করেন। এই টাকায় ১৮৮৯ সালে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং ঐ বছরই বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্টুয়ার্ট সি, বেইলি নতুন ভবনটি উদ্বোধন করেন (শরীফ, ২০০৭, পৃপৃ. ২৪৫-২৪৬, দ্রষ্টব্য কেদারনাথ, ২০০৮, পৃ, ৪২)।

৩.৩ ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

১৯২৫ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট। ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরবর্তীকালে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলন উপমহাদেশের জনগণকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন এবং স্থানীয় জনগণের দ্বারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য জাতীয় স্কুল, কলেজ এবং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানায়। ফলে বাংলা প্রদেশে আধুনিক ওষুধের জাতীয় ডাক্তার তৈরির জন্য দুটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরকম একটি মেডিকেল স্কুল ছিল কলকাতায়, যার নাম ছিল ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট এবং অন্যটি ঢাকায়, যার নাম ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট। জমিদার রঘুনাথ দাস ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন (ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ২০২৪)। হাসপাতাল ভবনটি নির্মানের জন্য এই ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকগণ তাঁদের মাসিক বেতন প্রদান করেন এবং অনেক দানশীল ব্যক্তি ৯০,০০০ টাকা চাঁদা প্রদান করেন (নূরুল, ২০০৩, পৃ. ৪৭৩)।

৩.৪ ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা

১৯১২ সালে প্রথম ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববদ্যিালয় কমিটি বা নাথান কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। কিন্তু নানা কারণে এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক সংকট এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে এর জন্য দায়ী করা যায়। তবে অর্থনৈতিক সংকটই যে অন্যতম প্রধান কারণ তা বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং উপাচার্যের বক্তব্য থেকে জানা যায়। ১৯২৯ সালে ঢাকার নওয়াবপুরের ধনাঢ্য ব্যক্তি জগমোহন পালের উত্তরাধিকারীগণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই প্রধানতম বাধাটি দূর করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৪ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। তবে এই টাকা হস্তান্তর করতে বেশ কয়েক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ১৯৩৪ সালে এই টাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করা হয়। কিন্তু ঢাকায় একটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবে, নাকি ঢাকা মেডিকেল স্কুলটিকেই কলেজে রূপান্তর করা হবে, বিষয়টি নিয়ে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে বিতর্ক চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধীরগতি আসে। এতে বিরক্ত হয়ে জগমোহন পালের উত্তরাধিকারীগণ তাঁদের প্রদত্ত অর্থ সুদসহ ফেরত দেয়ার দাবিও জানিয়েছিলেন। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় (চাঁদ, ২০২১)।

৪. উপসংহার

সুবাদার মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা হতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের পর ক্রমান্বয়ে ঢাকার নাগরিক সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পেতে থাকে এবং রাজপৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ঢাকা একটি প্রায় পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ হতে তৎকালীন ঢাকার শোচনীয় অবস্থার একটি সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পরও ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সরকার দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকে। ফলে ঢাকাবাসীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতে সচেষ্ট হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, নগরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে

গৃহীত ব্যক্তিগত উদ্যোগের কথা বলা যায়। তবে এই ব্যাপারে ঢাকায় বসবাসকারী ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গকেই উদ্যোগী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকায় একটি মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশনে প্রথম সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আর পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে ঢাকা মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠার পর যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছিল তার একটা বড় অংশ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় করা হয়েছিল। মাঝে মধ্যে সরকার কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছিল, যা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই ছিল। এক্ষেত্রে ঢাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের আর্থিক অনুদান নিয়েও এগিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে ঢাকার নবাব পরিবার বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

নবাব আব্দুল গণির বদান্যতায় ঢাকাবাসীর জন্য প্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়। প্রথম দিকে এই সুবিধা ঢাকার প্রধান প্রধান সড়কসংলগ্ন এলাকাসমূহের জনগণ পেলেও পরবর্তীকালে তা সম্প্রসারণ করা হয়। আর এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায়ও ঢাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন। সরকার মাঝে মধ্যে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছিল বটে, তবে অনেক সময়ই দেখা যায় যে, সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তা নিজস্ব আয় থেকে কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়েছিল। এছাড়াও নগরবাসী আর্থিক অনুদানের বিনিময়ে বিভিন্ন রাস্তার নাম নিজের বা পরিবারের সদস্যের নামে নামকরণ করে। এসব অনুদানের অর্থে ঢাকায় নতুন রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা ও ড্রেন মেরামত, এবং বিজলি বাতি ও পানির পাইপ সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়া জ্বালানী কাঠের উচ্চ মূল্যের কারণে ঢাকার শ্মশানগুলোতে যথাযথভাবে শবদাহ করা হতো না। ফলে প্রচুর আধা-পোড়া মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো। অন্যদিকে মুসলমানরাও লোকালয়ের যত্রতত্র মৃতদেহ কবর দিতো। হিন্দু ও মুসলমানদের মৃতদেহ সৎকারে এই অব্যবস্থাপনা ছিল জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ঢাকা মিউনিসিপালিটির প্রচেষ্টায় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সহায়তায় হিন্দুদের জন্য যেমন নগরীর সুবিধাজনক স্থানসমূহে শ্মশান নির্মাণ ও নির্দিষ্ট মূল্যে জ্বালানী কাঠ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি মুসলমানদের জন্যও কয়েকটি কবরস্থান স্থাপন করে নির্দিষ্ট স্থানে মৃতদেহ কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মৃতদেহ সৎকারজনিত অব্যবস্থাপনা হতে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পায়।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রেও ঢাকাবাসী দান-অনুদানের মাধ্যমে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ঢাকায় একটি

নেটিভ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে দেশীয়দের আধুনিক চিকিৎসা সেবার উদ্যোগ নিলেও প্রয়োজনের তুলনায় এটা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত মিটফোর্ড হাসপাতালটিই হয়ে উঠে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের মানুষের আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণের প্রধানতম কেন্দ্র। এ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল মিটফোর্ডের উইল করে রেখে যাওয়া টাকায় এবং এর সার্বিক উন্নতি ঘটেছিল দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অকাতর অনুদানের মাধ্যমে। শুধু মিটফোর্ড হাসপাতাল নয়, ঢাকা মেডিকেল স্কুল, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট এবং এমনকি ব্রিটিশ শাসনামলের একেবারে শেষ সময়ে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও দেশীয়দের দান-অনুদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই বলা যায়, ঢাকায় আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন এবং এর উন্নয়নের মূল কৃতিত্ব দেশীয়দেরই প্রাপ্য।

ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন ও ঢাকাবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এককভাবে সর্বোচ্চ দান করেছিল ঢাকার নবাব পরিবার। তাঁদের এই অকাতর দানের অন্তর্নিহিত কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যশ, খ্যাতি এবং সরকারের আনুকূল্য লাভই এইসব জন্যকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্য বলে মনে করা হলেও এর পিছনে যে জনগণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি যে ছিল এ কথা অস্বীকার করার অবকাশ নাই।

অন্ত্য-টীকা

১. উনিশ শতকে ঢাকায় বসবাসরত ইউরোপীয় পরিবারগুলির মধ্যে ব্যবসায় এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ওয়াইজ পরিবার অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। এই পরিবারের তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তিরই পারিবারিক নাম ওয়াইজ হওয়ায় অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই পরিবারের সদস্য থমাস আলেকজান্ডার ওয়াইজ (১৮০২-১৮৮৯) ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁর ভাই জোসিয়া প্যাট্রিক ওয়াইজ ছিলেন এ কজন নীলকর। এই পরিবারের অন্য আরেক সদস্য জেমস ফওনস নর্টন ওয়াইজ (১৮৩৫-১৮৮৬) ছিলেন ঢাকার সিভিল সার্জন। তিনি জেমস ওয়াইজ নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন।

সহায়কপঞ্জি

আলম, সৈয়দ শাহ (২০০৩)। 'ঢাকা পৌরসভার বিকাশ'। *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা* [সম্পা. ইফতিখার-উল-আউয়াল], বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর,ঢাকা। পৃ. ৫৬-৫৯।

ইব্রাহীম, মুহাম্মদ (২০০৩)। 'ইতিহাসের ঢাকা নগরী : প্রযুক্তি ও জনজীবন'। *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা* [সম্পা. ইফতিখার-উল-আউয়াল], বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা। পৃ. ১৭৮-১৮৭।

কেদারনাথ, মজুমদার (২০০৮)। *ঢাকার বিবরণ ও ঢাকা সহচর*, [সম্পা. আবুল বাশার]। গতিধারা, ঢাকা।

চাঁদ সুলতানা, কাওছার। (২০২১)। 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৪৭-১৯৭১)'। [পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

তায়েশ, মুনশী রহমান আলী। (১৯৮৫)। *তাওয়ারিখে ঢাকা*। ডক্টর আ. ম. ম. শরফুদ্দীন অনুদিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

নাজমুন, সৈয়দা নাহার। (১৯৯৯)। *ঢাকার রাজপথের ইতিহাস*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

নাজির, আহমেদ (২০০৩)। 'ঢাকার মহল্লা ও রাস্তাঘাটের নামকরণের ইতিহাস'। *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা* [সম্পা. ইফতিখার-উল-আউয়াল], বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর,ঢাকা। পৃ. ৪৮-৫৫।

নূরুল, ইসলাম (২০০৩)। 'ঢাকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা: অতীত ও বর্তমান'। *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা* [সম্পা. ইফতিখার-উল-আউয়াল], বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর,ঢাকা। পৃ. ৪৭১-৪৮৪।

মামুন, মুনতাসীর। (বা. ১৪০০)। *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা।

যতীন্দ্রমোহন রায়। (২০০৭)। *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড। বইপত্র, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ, খান (২০০৩)। 'বিদেশী পর্যটকদের চোখে ঢাকা'। *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা* [সম্পা. ইফতিখার-উল-আউয়াল], বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা। পৃ. ৬০-৭৫।

শরীফ উদ্দিন, আহমেদ। (২০০৭)। *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৮৫৮-১৯৪৭*। একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (১৯৯০)। 'স্মৃতির শহর'। *ঢাকা গ্রন্থমালা ৪*। ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা।

সুফিয়া, আহমেদ (২০০৩)। 'ঢাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকার নবাব পরিবারের ভূমিকা'। *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা* [সম্পা.ইফতিখার-উল-আউয়াল], বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা। পৃ. ৩৪-৪৭।

Bamber, C. J. (1909). Sanitary Comissioner's Inspection Report on the Improvement of the Sanitary Condition of Dhaka. NAB.

Dhaka National Medical College. (2024). History: College Background. https://dnmc.edu.bd/history_text#:~:text=The%20Dhaka%20National%20Medical%20College,and%20the%20Indian%20Muslim%20League

Hare, E. C. (1908). Inspection Note on the Dhaka Municipality by the Sanitary Commissioner, Eastern Bengal and Assam. Bangladesh National Archives (hereafter NAB).

Macdonald, W. (1907). Note by Mr. W. Macdonald, Chief Engineer, Eastern Bengal and Assam on the proposal for increasing and improving the water supply at Dacca. NAB.

Mamoon, Muntassir. (1991). *Dhaka: Tale of a City*. Trns. Shaheen Ahmed. Dhaka Study Series 11. Dhaka City Museum. Dhaka.

Momin, Abdul Chowdhury, & Shabnam, Faruqui (2009). 'Physical Growth of Dhaka City'. In Sharif Udddin Ahmed (ed). *Dhaka: Past Present Future*. Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Rankin, J. T. (1904). Note on the Dhaka Water Works: Improvement Scheme. NAB

Sharif Uddin, Ahmed. (1986). *Dacca: A Study in Urban History and Development*. Curzon Press, London.

Sharif Uddin, Ahmed. (2003). *Dhaka: A Study in Urban History and Development 1840-1921*. Academic Press and Publishers Limited, Dhaka.

Sirajul, Islam. (2014). 'Kotwal'. In Sirajul Islam (eds.) Banglapedia: the National Encyclopedia of Bangladesh (Online ed.). Dhaka, Bangladesh: Banglapedia Trust, Asiatic Society of Bangladesh. Retrieved from https://en.banglapedia.org/index.php?title=Kotwal (20 February 2024)

Taifoor, Syed Muhammad. (1956). *Glimpses of Old Dhaka: A short Historical Narration of East Bengal and Assam with Special Treatment of Dhaka* (Revised and Enlarged Second Edition), Lulu Bilquis Banu and others. Dhaka.

Yousoff, K. Mohamed (1910). Report on the Dacca Water Works. NAB.

Yousoff, K. Mohamed (1909). Letter from Khan Bahadoor Muhamed Yousoof to the Magistrate of Dhaka. NAB.